প্রথম অধ্যায়

বিবেকানন্দের জীবনী

প্রথম অধ্যায়

বিবেকানন্দের জীবনী

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কলকাতার সিমলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম হল নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডাকনাম বিলে। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। দত্তবংশের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহাকুমার অন্তর্গত 'দত্তডেরিয়াটোনা' বা 'ডেরেটোনা' গ্রামে। এঁদের পূর্বপুরুষ হলেন রামনিধি দত্ত। তিনি পুত্র রামজীবন দত্ত ও নাতি রামসুন্দর দত্তকে নিয়ে কলকাতায় গড়-গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। রামসুন্দরের পুত্র রামমোহন দত্তের সময় থেকেই দত্তবংশের প্রচুর সম্পত্তি বৃদ্ধি ও অর্থসমাগম হয়। রামমোহন দত্ত ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের ম্যানেজিং ক্লার্ক। তিনিই ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটে বাড়ি তৈরি করান। এছাড়াও তাঁদের হাওড়ার সালকিয়ায় দুটি উদ্যানবাড়ি এবং খিদিরপুরে বেশকিছু ভূসম্পত্তি ছিল। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে রামমোহন দত্ত কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। রামমোহন দত্তের দুই পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। এদের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ হলেন স্বামীজীর ঠাকুরদা। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তিনি শ্যামবাজারের দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের ছোট মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে বিয়ে করেন। দুর্গাপ্রসাদ ও শ্যামাসুন্দরীর সন্তান হলেন বিশ্বনাথ দত্ত। অবশ্য তাঁদের এক কন্যাসন্তানও ছিল। এই কন্যাসন্তানটি সাত বছর বয়সে মারা যায়। দুর্গাপ্রসাদ বিষয়ী লোক ছিলেন না। সংসার বিমুখ এই মানুষটি সন্ন্যাস গ্রহণ

করেন। তবে তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ দত্ত উদার মনের প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা, ইংরাজী, আরবী, উর্দু, হিন্দি, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা তিনি জানতেন। ছোটবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথের উপর তাঁর পিতার প্রভাব যথেষ্টই ছিল। বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষাগ্রহণ এবং চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ দত্তের সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি ছিল। অবশ্য বিশ্বনাথ দত্ত আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি করতেন। যৌথ পরিবারের সদস্যগণসহ অনেক আত্মীয়-স্বজনও তাঁর উপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত হত। কর্মসূত্রে তাঁকে প্রায়ই বাংলার বাইরে বিলাসপুর, রায়পুরের মত নানা স্থানে যেতে হত। তাঁর সংগীতের প্রতি আলাদা আকর্ষণ ছিল। তিনি সাহিত্যের চর্চাও করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা হল— 'সুলোচনা' ও 'শিষ্টাচার পদ্ধতি'।

বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন নন্দলাল বসু ও রঘুমণি দেবীর একমাত্র কন্যা। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও ভক্তিপরায়ণা নারী। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করতেন। সন্তানদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে তাঁর ছিল সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। ভুবনেশ্বরী দেবী দশটি সন্তানের জননী ছিলেন। এরমধ্যে তাঁর প্রথম দুটি সন্তান (একটি পুত্র ও একটি কন্যা)-এর শৈশবেই মৃত্যু ঘটে। তৃতীয় সন্তান হরমোহিনী বা হারামণির মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে মৃত্যু ঘটে। চতুর্থ সন্তান স্বর্ণময়ী দীর্ঘজীবী ছিলেন। পঞ্চমটি ছিল কন্যাসন্তান। তাঁরও শৈশবে মৃত্যু ঘটে। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতা-মাতার ষষ্ঠ সন্তান। নরেন্দ্রনাথের পরে যথাক্রমে কিরণবালা (সপ্তম), যোগেন্দ্রবালা (অষ্টম), মহেন্দ্রনাথ (নবম) ও ভূপেন্দ্রনাথ (দশম তথা কনিষ্ঠ) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের শৈশবে মৃত্যু ঘটলে এবং তারপরের তিনটি কন্যাসন্তান হওয়ায় ভুবনেশ্বরী দেবী পুত্রসন্তানের

জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য তিনি পুত্রলাভের আশায় কাশীতে বসবাসকারী দত্ত পরিবারের জনৈকা আত্মীয়াকে বীরেশ্বর শিবের মন্দিরে পূজা দিতে অনুরোধ করেন এবং নিজেও পূজা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর 'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "একদিন প্রভাতে শিবপূজান্তে দেবী ভুবনেশ্বরী ধ্যানস্থা হইলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। দেবী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সত্তা শিবভাবনায় তন্ময়। ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোকে তাঁহার তপঃক্লিষ্ট সংযমপুণ্যোজ্জ্বল বদনখানি স্বর্গীয় বিভায় মণ্ডিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। গভীর রজনীতে শ্রান্তদেহা জননী নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। বহুদিনের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হইল। ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখিলেন— তুষারধবল রজতভূধরকান্তি কৈলাসেশ্বর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ধীরে ধীরে দৃশ্য পরিবর্তিত হইল; ভক্তের বিস্ময়বিমুগ্ধ হৃদয় অপূর্ব আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া তিনি ক্ষুদ্র শিশুমূর্তি ধারণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।"[১]

ধর্মপরায়ণা ভুবনেশ্বরী দেবী বিশ্বাস করতেন শিবের বরেই তিনি নরেন্দ্রনাথকে লাভ করেছেন। মনীন্দ্রকুমার সরকার ভুবনেশ্বরী দেবীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "ঘরনী ভুবনেশ্বরী অতি ভাগ্যবতী।
> ভোলা মহেশের পাশে উমা হৈমবতী।।
> পতিব্রতা সেবাময়ী রত্নপ্রসবিনী।
> রূপে গুণে বিভূষিতা যতীন্দ্র-জননী।।
> রমণীকুলের গর্ব ভক্তিপরায়ণা।

সুখে-দুঃখে অবিচল সুধন্য ললনা।।

অত বড় সংসারের মস্ত দায়ভার।

বহিতেন হাসিমুখে রহি নির্বিকার।।

এরি ফাঁকে সূচীকর্ম গ্রন্থ-অধ্যয়ন।

পাড়াপড়শীর সঙ্গে হৃদ্য আলাপন।।

তেজস্বিনী স্থিরবুদ্ধি গম্ভীর প্রকৃতি।

এমন রমণীরত্ন সুদুর্লভ অতি।।

দয়াময়ী দানশীলা-আর্ত ও ক্ষুধিত।

তাঁর দয়া চেয়ে কেহ হয়নি বঞ্চিত।।

মধুকণ্ঠী সুগায়িকা—ভজন কীর্তন।

গাহিতেন, শুনে মুগ্ধ হত শ্রোতাগণ।।"[২]

নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠনে মায়ের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বামীজী একথা বারবার উল্লেখ করেছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজীর মায়ের প্রতি আজীবন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। আবার ভুবনেশ্বরী দেবীও সবসময় চেষ্টা করেছেন সন্তানদের সুশিক্ষা দেবার। 'স্বামীজীর মাতৃভক্তি' গ্রন্থে স্বামী তথাগতানন্দ ভুবনেশ্বরী দেবীর এই গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "স্বামীজীর মা সবসময় তাঁর সন্তানদের সত্যবাদী, সৎ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং মানবিক হবার জন্য প্রেরণা দিতেন। শৈশবে তাদের নমনীয় চিত্তে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের মহত্তম আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন এবং প্রকৃত মূল্যবোধের বীজ বপন করেছিলেন।"[৩]

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিল দুরন্ত ও ডানপিটে। সবকিছুর প্রতিই ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বড়দের অনুশাসন তাঁকে বাগে আনতে পারত

না। বাড়ির আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র রেগে গেলে ভেঙ্গে তচনচ করে দিতেন। স্বামী শান্তরূপানন্দ তাঁর 'বিবেকানন্দ চিত্রকথা' গ্রন্থে বিলের রাগ কমানোর অদ্ভুত উপায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "বিলের রাগ কমানোর এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। কিছুতেই না পারলে বিলের মাথায় হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিতেন। আর জপ করতেন "শিব শিব"। অমনি দুষ্টুমি বন্ধ। বিলে একেবারে শান্ত। আবার তিনি ভয় দেখাতেন, "যদি দুষ্টুমি করিস তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।" ব্যস্ সব ঠাণ্ডা।"[৪]

গরীব-দুঃখীর প্রতি ছিল নরেন্দ্রনাথের অসীম দয়া। মা তাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখলেও জানালা দিয়ে হাতের কাছে যা কিছু পেতেন তা গরীব-দুঃখীদের দিয়ে দিতেন। আবার একদিন বন্ধুদের সঙ্গে ধ্যান ধ্যান খেলাতে এতটাই ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন যে, সামনে সাপ আসলেও নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ভাঙেনি। তাঁর দিদিরা দুষ্টুমির জন্য তাঁকে ধরতে গেলে সহজেই নর্দমায় বা ড্রেনে নেমে গিয়ে দিদিদের ডাকতেন। দিদিরা কিন্তু নর্দমায় নামতেন না। এছাড়াও চাপাগাছে ব্রহ্মদত্যির প্রসঙ্গ, ট্র্যাপিজ খাটানোর ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিলের সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী মুমুক্ষানন্দ প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা' গ্রন্থে নরেন্দ্রনাথের শৈশবের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> "খুব ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুরন্ত এবং রঙ্গরস ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা যেত। রামসীতা, শিব বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করা বা তাঁদের মূর্তি ধ্যান করা এইসব তাঁর খেলাধূলার বিষয় ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের যেসব গল্প

তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন সেসব তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। সাহস, দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের প্রতি আকর্ষণ— এইসব বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে লক্ষ্য করা যেত। এমনকি শৈশবকালেই তিনি সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তির উপস্থাপন চাইতেন।"[৫]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং মেধাশক্তিও ছিল প্রখর। তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হয় গৃহশিক্ষকের কাছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রামায়ণ প্রভৃতি অনায়াসেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে তখনকার প্রচলিত নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পাশাপাশি হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপালবাবুর জিমন্যাস্টিকের আখড়াতেও যাতায়াত শুরু করেন। এছাড়াও বক্সিং, সাঁতার, অভিনয় ইত্যাদি ছিল তাঁর চর্চার বিষয়। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থের 'নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়' শীর্ষক অংশে জানিয়েছেন—

"জ্ঞানার্জনের ন্যায় ব্যায়াম-অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অনুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্‌ন্যাস্টিক, কুস্তি, মুদ্গরহেলন, যষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে-সকল বিদ্যা শারীরিক বলের ও শক্তিপ্রয়োগকৌশলের উৎকর্ষ-সাধন করে প্রায় সেই সকলেই তিনি অল্পবিস্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তখন তখন পূর্বোক্ত বিদ্যাসকলের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক পারিতোষিক প্রদান করা হইত। আমরা

শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখন কখনও উক্ত পরীক্ষা প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।”[৬]

বিশ্বনাথ দত্ত কর্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে থাকতেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে যান। রায়পুরে যাবার পথে নরেন্দ্রনাথ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। বনের মধ্য দিয়ে পথ চলার পথে তাঁর ধ্যানতন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেছেন—

“মধ্যপ্রদেশের সর্বত্র তখনও রেললাইন হয় নাই। এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া চলিত। নাগপুর হইতে রায়পুর যাইতে হইলে প্রায় পক্ষাধিককাল গো-শকটে যাইতে হইত। সুদীর্ঘ পথ ঘুরিয়া অর্ধ ভারতবর্ষ অতিক্রমণের ফলে নরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে দেশজননীর বিচিত্র রূপ এক মোহময় ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপের ভান্ডার আজ তাঁহার সম্মুখে কে যেন থরে থরে সাজাইয়া দিল। কিশোর কবি-হৃদয়ের প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্যতৃষ্ণা অনন্ত অফুরন্তের মধ্যে তৃপ্তির আনন্দে ডুবিয়া গেল। এই দিব্যানুভূতির কথা নরেন্দ্রনাথ জীবনে বিস্মৃত হন নাই।”[৭]

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাধারণ বিভাগে ভর্তি হন। এরপর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। বাধ্য হয়ে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে আইন নিয়ে পড়া শুরু করলেও

শেষপর্যন্ত তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এই সময় নরেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি পড়ে ফেলেছিলেন। বহু গ্রন্থপাঠের ফলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুধা বিস্তৃত। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার স্বামী সারদানন্দ 'সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা' প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে এফ.এ. পরীক্ষার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিল-প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকসকলের মতবাদ তিনি ইতঃপূর্বেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; এখন—ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম এবং বেনের 'নাস্তিকতা', স্পাইনোজার 'অদ্বৈতচিদ্বস্তুবাদ', ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ' ও কোঁতে ও স্পেন্সরের 'অজ্ঞেয়বাদ' এবং আদর্শ সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদসমূহ আয়ত্ত করিয়া সত্যবস্তু নির্ণয় করিবার বিষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে উপস্থিত হইয়াছিল। জার্মান দার্শনিকসকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দর্শনেতিহাস গ্রন্থসকলের সহায়ে তিনি কান্ট, ফিক্‌টে, হেগেল, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মেডিকেল কলেজে যাইয়া শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ ও গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ফলে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পাশ্চাত্য-দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষ সদ্বস্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভের নিশ্চয় উপায় জানিতে পারা এবং শান্তিলাভ করা দূরে থাকুক, মানব-মন-বুদ্ধি-প্রচারের সীমা ও ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত,

সত্যবস্তুকে প্রকাশ করিবার উহাদের নিতান্ত অসামর্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া তাঁহার প্রাণে অশান্তির স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।"[৮]

একাগ্রতা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বিবেকানন্দ অল্প সময়ে বহু গ্রন্থপাঠ করতে পারতেন।

ছাত্রাবস্থাতেই নরেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম সম্পর্কে নানা কৌতূহল জাগে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এছাড়াও কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তিনি সংগীত পরিবেশন করতেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করলেও তাঁর মনের অনেক প্রশ্নের উত্তরই তিনি পাননি। সুতরাং একটা অস্থিরতা তাঁর মধ্যে ছিল।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেবের কাছে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা জানতে পারেন। হেস্টি সাহেব ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা আলোচনাকালে প্রকৃতি তন্ময়তা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধির কথা উল্লেখ করেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বনাথ দত্ত নরেন্দ্রনাথের বিয়ে দিতে উদ্যোগী হলে নরেন্দ্রনাথ প্রবল আপত্তি করেন। আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত ও প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যান। নরেন্দ্রনাথের তীব্র আধ্যাত্মিক আকুলতার উত্তর মেলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। স্বামী মুমুক্ষানন্দ প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা' গ্রন্থে ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথের কথোপকথন অংশটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> "নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন : 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণের ইতিবাচক উত্তর : 'হ্যাঁ আমি তাঁকে দেখেছি, এই যেমন এখানে তোমাকে দেখেছি ঠিক সেইভাবে, বরং আরও স্পষ্টভাবে।' অবশেষে তিনি একজনকে পেলেন; যিনি তাঁর নিজস্ব অনুভব থেকে তাঁকে বলতে পারেন যে ঈশ্বর আছেন। তাঁর সন্দেহ দূরীভূত হলো—শিষ্যের শিক্ষা শুরু হলো।"[৯]

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নানাভাবে পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বনাথ দত্ত পরলোক গমন করেন। বিধবা মা ও ভাইবোনদের নিয়ে সংসার চালানোর দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথকে নিতে হয়। অভাব অনটনের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ কাজের চেষ্টা করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেও আকুল প্রার্থনা জানান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে মা কালীর কাছে এ সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে নির্দেশে দিলে তিনি মা কালীর কাছে পরিবারের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের কথা না বলে নিজের জন্য বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি চেয়ে বসেন। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে তাঁদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব আর হয়নি। এভাবেই গুরু তাঁর উপযুক্ত শিষ্য পেলেন। নরেন্দ্রনাথের ক্ষমতা ও গুণের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন সময়ে নানা আলোচনায় ব্যক্ত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গলার রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে প্রথমে শ্যামপুকুর ও

পরে কাশীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন—

> "কাশীপুরে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত হইয়া আছেন (১৮৮৬ খ্রীঃ) একদিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন—"নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।"
>
> স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস; তাঁহারই দূত হইয়া তাঁহার মঙ্গলবার্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।"[১০]

নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের চেষ্টায় আকুল হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাতে আপত্তি জানান। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথন প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেছেন—

> "নরেন্দ্রনাথের প্রথম নির্বিকল্প সমাধি লাভের কিছুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুই কি চাস?" তাহাতে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ-ছয়দিন সমাধিতে লীন হইয়া থাকি, পরে একটু নিচে নামিয়া শুধু দেহরক্ষার জন্য কিছু খাইয়া আবার সমাধিতে ডুবিয়া যাই।" ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "লজ্জা করে না তোর একথা বলতে! তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! ভেবেছিলাম কোথায় একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা নয়, তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস!"[১১]

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বের প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা মাস্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'র দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন—

"কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যানসার রোগে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার তাহলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন—**"যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"** নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।"[১২]

এরপর নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইয়েরা ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে বড়দিনের রাতে হুগলীর আঁটপুরে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শকে সামনে রেখে নরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য গুরুভ্রাতারা অত্যন্ত কষ্টে বরানগর মঠে পূজা, শাস্ত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বরানগর মঠে তাঁরা বিরজাহোম করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ কাশী যাত্রা করেন। এখানে ত্রৈলঙ্গস্বামী ও ভাস্করানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখানকার দুর্গামন্দির থেকে ফেরার পথে একদিন স্বামীজীকে কিছু বানর তাড়া করে, স্বামীজীও ভয়ে ছুটতে থাকেন। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পরামর্শ শুনে স্বামীজী বানরগুলির মুখোমুখি রুখে দাঁড়ান, তাতে বানরগুলিও ছুটে পালায়। এই অভিজ্ঞতার কথা স্বামীজী পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। জীবনে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা এই ঘটনা থেকে স্বামীজী গ্রহণ করেন। এরপর কাশী থেকে বরানগর মঠে ফিরে আসলেও কিছুদিন পরে আবার তিনি কাশী যাত্রা করেন। কাশীর জমিদার প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি কাশী থেকে

অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যান। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বৃন্দাবনে স্বামীজী কালাবাবুর কুঞ্জে ছিলেন। হরিদ্বার যাবার পথে হাতরাস স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার শরচ্চন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামী সর্বভূতানন্দ প্রকাশিত 'পরিব্রাজক স্বামীজী : দেশে ও বিদেশে (বরানগর মঠ থেকে শিকাগো)' গ্রন্থে শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

> "স্বামীজীর চোখ শরচ্চন্দ্রকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তীকালে শরচ্চন্দ্র বলতেন : 'আমি স্বামীজীর সেই ভয়ঙ্কর চোখ দুটিরই পিছু নিলাম।' স্বামীজীকে শরচ্চন্দ্র বললেন : 'আমায় কিছু উপদেশ দিন।' উত্তরে স্বামীজী ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য থেকে সুন্দরের প্রতি মালিনীর উক্তিটি সুর করে গাইলেন : 'বিদ্যা যদি লভিতে চাও, চাঁদমুখে ছাই মাখ, নইলে এই বেলা পথ দেখ।' শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর কথার তাৎপর্য বুঝলেন। বুঝলেন : স্বামীজী চাইছেন সর্বস্ব ত্যাগ।"[১৩]

শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী সদানন্দ। কলকাতায় প্লেগ রোগে আক্রান্তদের স্বামী সদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে সেবা করেন। স্বামীজীকে তিনি আজীবন সেবা করেছেন এবং অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে হাতরাস থেকে স্বামীজী হৃষীকেশ যান। এই স্থানে তিনি মন দিয়ে সাধন ভজন করেন। তাঁর নিজের ও শিষ্য সদানন্দের শারীরিক অসুস্থতার কারণে পুনরায় তিনি বরানগর মঠে ফিরে আসেন। বরানগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে স্বামীজী আনন্দে দিন কাটাতে থাকেন। মাঝে একবার গ্রীষ্মকালে শিমুলতলায় যান। এরপর তিনি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে

আবার বৈদ্যনাথধাম যাত্রা করেন। এরই মধ্যে স্বামীজী খবর পান গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ অসুস্থ। এই অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি স্বামীজী গাজীপুরে পৌঁছান। গাজীপুরে পওহারীবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। পওহারীবাবা গুহায় বাস করতেন। স্বামীজী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করবেন। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের পূর্বদিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নদর্শনে তা আর শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। গাজীপুরে থাকাকালীন গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের অসুস্থতার খবরে স্বামীজী কাশীতে চলে আসেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি খবর পান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত ও বিপদের বন্ধু বলরাম বসু পরলোক গমন করেছেন। বলরাম বসুর শোকে স্বামীজী অশ্রুবিসর্জন করেন। প্রমদাদাস মিত্র সন্ন্যাসীর অশ্রুবিসর্জনকে সমর্থন করতে পারেননি। স্বামী সর্বভূতানন্দ প্রকাশিত 'পরিব্রাজক স্বামীজী দেশে বিদেশে' গ্রন্থে ঘটনাটির বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

> "স্বামীজী তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন : 'বলেন কি? সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয়টা বিসর্জন দেব?... যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।' বলরামবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই স্বামীজী বরানগর মঠে ফিরে এলেন।"[১৪]

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীশ্রীমাসারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে স্বামীজী পুনরায় ভারতপরিক্রমায় বের হন। হিমালয়, নৈনিতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, টিহিরি, রাজস্থানের জয়পুর, আলোয়ার, খেতড়ি, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র,

কর্ণাটক, কন্যাকুমারী, হায়দ্রাবাদ, তামিলনাড়ু, প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন—

> "উত্তর হইতে দক্ষিণে সর্বত্রই ভারতের এই প্রাচীন ভূমি অসংখ্য দেবদেবীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সে দেবদেবীর অবিরাম অগণিত বাহুমালা একটি মাত্র ভগবানেই রূপায়িত হইয়াছে। দেহে ও মনে তাঁহাদের যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন। সকল জাতির ও বিজাতির সকল মানুষের সহিত মিশিয়াও এই ঐক্যের কথা তিনি বুঝিতে পারেন। এই ঐক্য উপলব্ধি করিতে তিনি সকলকে শিক্ষা দেন। একে যাহাতে অন্যকে বুঝিতে পারে, সেই জন্য তিনি একের বাণী অন্যের নিকট বহিয়া লইয়া যান— যাঁহারা অতিমানসিক শক্তির অধিকারী, যাঁহারা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁহাদিগকে তিনি দেব-মূর্তিগুলিকে শ্রদ্ধা করিতে বলেন; যুবকদিগকে তিনি বেদ, পুরাণ, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি পড়তে এবং তাহার চেয়েও বেশি করিয়া বর্তমান মানুষকে বুঝিতে বলেন; এবং সকলকে তিনি বলেন, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ধর্মের আবেগে ভালোবাসিতে, তাহার মুক্তির জন্য আকুল হইয়া আত্মবলি দিতে।"[১৫]

ভারত পরিক্রমাকালে পরিব্রাজক স্বামীজী ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করেছেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক রেখেছেন, তেমনি নির্দ্বিধায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিত্র স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজন্যবর্গের সঙ্গে স্বামীজী কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী হয়েও কেন সম্পর্ক রাখতেন সেই বিষয়ে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সত্যের সন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ জীবন ও দর্শন' গ্রন্থে লিখেছেন—

"স্বামীজী এই সমস্ত রাজন্যবর্গের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন। সন্ন্যাসী কেন এত রাজরাজাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন এই নিয়ে একবার প্রশ্ন করাতে স্বামীজী বলেছিলেন, 'গরিব প্রজার ইচ্ছা থাকলেও সৎকার্য করবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোন রূপে তাঁহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি। তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হইবে।' এটাও ঠিক যে প্রব্রজ্যাকালে স্বামীজী যতজন রাজা বা রাজকর্মচারির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর কথায় গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন কিংবা পরে কেউ কেউ শিষ্যত্ব নিয়েছেন বা অনুগামী হয়ে পড়েন।"[১৬]

স্বামীজী অনুধাবন করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। স্বামী প্রভানন্দ 'বিশ্বশিক্ষক বিবেকানন্দ' শীর্ষক আলোচনায় লিখেছেন—

"প্রব্রজ্যাকালে ভারতবর্ষের বিষয়ে প্রত্যক্ষ, পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানার্জন ও অভিজ্ঞতা-লাভও বিবেকানন্দ-জীবনে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিব্রাজক জীবন বিবেকানন্দকে আমূল বদলে দিয়েছিল। তিনি সর্বার্থেই মনুষ্যত্বের প্রেমিক হয়ে ওঠেন, 'সর্বভূতহিতেরতাঃ' (সকলের কল্যাণে আত্মনিবেদন) হয়ে ওঠে তাঁর জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র।"[১৭]

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী রাজস্থানের আলোয়ারে ছিলেন। এখানে তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। আলোয়ারের জনৈক মৌলবী স্বামীজীর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে স্বামীজী আতিথ্য গ্রহণ করেন।

আলোয়ারের মহারাজ মঙ্গল সিং মূর্তি পূজা সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন না। স্বামীজী তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন করে দেন। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "দেওয়ালে মহারাজের একটা ছবি ছিল। স্বামীজী সেটা নামিয়ে আনতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন : 'এ কার ছবি?' দেওয়ানজী বললেন : 'মহারাজের।' স্বামীজী বললেন : 'এর উপর থুতু ফেলুন তো!' সকলেই স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত—মহারাজের সামনেই এ কী উদ্ভট আদেশ করছেন স্বামীজী! এদিকে স্বামীজী বলেই যাচ্ছেন বারবার : 'ফেলুন এতে থুতু, ফেলুন!' অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেওয়ানজী বললেন : 'কি বলছেন স্বামীজী? এ যে আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি!' স্বামীজী বললেন : 'হলোই বা তাই, কিন্তু মহারাজ তো আর সশরীরে এ ছবির ভেতর নেই! এর ভেতর তো আর মহারাজের হাড়-মাস বা রক্ত নেই। মহারাজের মতো এ নড়ে-চড়ে না, কথাও কয় না। তবু আপনারা কেউ এতে থুতু ফেলতে রাজী নন এইজন্য যে, আপনারা এর মধ্যে মহারাজের কায়ার ছায়া দেখতে পান। সত্যি কথা বলতে কি, এর উপর থুতু ফেলতে গেলে আপনাদের মনে হয়, আপনাদের প্রভুকে, স্বয়ং মহারাজকেই অপমান করা হচ্ছে।' তারপর স্বামীজী মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'দেখুন মহারাজ, একদিক থেকে যদিও আপনি এ ছবি নন, আর একদিক থেকে কিন্তু আপনি তাই। তাই আমি যখন ওতে থুতু ফেলতে বলেছিলাম, তখন আপনার একান্ত অনুরাগী কর্মচারীরা হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। এই ছবি তাঁদের আপনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই আপনাকে তাঁরা যতটা সম্মান করেন, এই ছবিকেও ঠিক তেমনি সম্মান করেন। যেসব ভক্ত কাঠ-মাটি

পাথরের প্রতিমা পূজা করেন তাঁদের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা খাটে।'... স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা শুনে মহারাজের মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর হল।"[১৮]

খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ ছিলেন স্বামীজীর বিশেষ বন্ধু ও শিষ্য। তিনি আজীবন স্বামীজীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। পুত্রসন্তানহীন অজিত সিংহ বিষণ্ণ ছিলেন। স্বামীজীর আশীর্বাদে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন। স্বামীজীর পরিবারকেও দুর্দিনে অজিত সিংহ আর্থিক সাহায্য করেছেন। খেতড়ির সাধারণ মানুষদের কাছে স্বামীজী অতি সহজেই পৌঁছে যেতেন। 'খেতড়ির জনজীবন ও স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক আলোচনায় তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"স্বামীজী তিনবার (১৮৯১, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৭ সাল) খেতড়িতে এসেছেন এবং মোট ১০৯ দিন সেখানে অতিবাহিত করেছেন। স্বামীজী বেলুড় মঠে অবস্থান করেছেন ১৭৮ দিন, সে কারণে তাঁর খেতড়িতে অবস্থানকাল বেলুড় মঠের পরেই।"[১৯]

স্বামীজীর জ্ঞানের গভীরতা ও আদর্শে মুগ্ধ খেতড়িরাজ অজিত সিংহ নিজের যেমন মনোবল ফিরে পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর রাজ্যের প্রজারাও স্বামীজীর ভাবাদর্শকে গ্রহণ করে শান্তিতে ছিলেন।

গুজরাটের আমেদাবাদ, লিমড়ি (লিমড়ী), জুনাগড়, ভুজ, পোরবন্দর, মাণ্ডবী প্রভৃতি স্থানে স্বামীজী ভ্রমণ করেন এবং এইসব স্থানের সাধারণ মানুষ ও রাজন্যবর্গের সান্নিধ্যে আসেন। আমেদাবাদে স্বামীজী ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনধারণ করতেন। এখানে তিনি লালশঙ্কর উমীয়াশঙ্করের গৃহে আশ্রয় পান। গুজরাটের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি স্বামীজী দর্শন করেন। বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। লিমড়ির বেশকিছু পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত

ভাষায় আলোচনা করেন। লিমড়িতে স্বামীজী সাধুদের দ্বারা বিপদে পড়েন। জনৈক বালকের মাধ্যমে তিনি লিমড়িরাজের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং লিমড়িরাজ ঠাকুরসাহেব স্বামীজিকে উদ্ধার করেন। স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ছিলেন ঠাকুরসাহেব। জুনাগড়ে থাকাকালীন স্বামীজী দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামীজীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন দেওয়ান সাহেব। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মধ্যে পত্রবিনিময় হয়। প্রসঙ্গত একটি পত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি চিকাগো থেকে স্বামীজী হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে একটি পত্রে লিখেছেন—

> "কয়েকদিন হয় আপনার শেষ চিঠিখানা পাইয়াছি। আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোটভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে, আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার মহান্ গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।"[২০]

গির্ণার পর্বতের প্রতি ছিল স্বামীজীর আলাদা আকর্ষণ। এই স্থানটির মনোরম পরিবেশে স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন—

“সুবিখ্যাত গির্ণার পর্বত জুনাগড় শহর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন—সর্বসম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি ও কীর্তি বা ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া সকলেরই নিকট আকর্ষণীয় হইয়া আছে। এখানে স্থানে স্থানে অনেকগুলি সুন্দর মন্দির, মসজিদ ও সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুকীর্তির স্মারকরূপে ‘খাপড়া খোদিয়া’ নামে কতকগুলি গুহা এখনও বিদ্যমান। সাম্প্রদায়িক উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি বিভিন্ন যুগে বিবিধ সম্প্রদায়ের মঠরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বামীজী এই সবই সাগ্রহে দর্শন করিলেন। তিনি পর্বতশৃঙ্গেও আরোহণ করিলেন। এই পথের আশেপাশে বহু মন্দির দেখা যায়; যে শিলাখণ্ডে সম্রাট অশোক তাঁহার চতুর্দশটি অনুশাসন ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। ভবনাথ নামে খ্যাত শিবের মন্দিরে সর্বদা বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। পথটি উপরে উঠিয়া খুবই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং কখন কখনও বা দূরতিক্রমণীয় দণ্ডায়মান শিলাখণ্ডের পার্শ্বভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৫০০ ফুট উপরে ‘ভৈরো ঝাম্পা’ (বা ভীষণ লম্ফ) নামে একটি স্থান আছে, যেখান হইতে লম্ফদানপূর্বক অনেকে সহস্র ফুট নিম্নে পতিত হইয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আরও ঊর্ধ্বে ২৩৭০ ফুট উপরে একটি দুর্গ প্রায় প্রাচীরবেষ্টিত দুর্ভেদ্য স্থানে ১৬টি জৈন মন্দিরদেখা যায়। এখানে আসিয়া স্বামীজী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং মন্দিরগুলির অপূর্ব ভাস্কর্য ও তীর্থঙ্করদের মণিরত্নবিভূষিত মূর্তিগুলি নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর আরও ঊর্ধ্বে, ৩৩৩০ ফুট উচ্চে পর্বতশীর্ষে আরোহণ করিয়া ঐ অঞ্চলের দূর দূরান্তরের মন্দিরাদি-সুশোভিত পুণ্যক্ষেত্রগুলি দেখিয়া তৃপ্তিবোধ করিলেন।”[২১]

এরপর স্বামীজী কচ্ছের রাজধানী ভুজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি সোমনাথ মন্দির, পোরবন্দর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, খাণ্ডোয়াতে স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় দিনযাপন করেন। খাণ্ডোয়ায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ারীলাল গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি পরিব্রাজক জীবনে মুসলমানের গৃহেও অন্ন গ্রহণ করেছেন।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী বোম্বে পৌঁছান। মহারাষ্ট্রের বোম্বে, পুণা, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে স্বামীজী ভ্রমণ করেন। পুণায় বালগঙ্গাধরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর হরিপদ মিত্রের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজী বেলগাঁও-এর বনবিভাগের সাবডিবিশন্যাল অফিসার হরিপদ মিত্রের বাড়িতে নয় দিন ছিলেন। হরিপদ মিত্র ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতী মিত্র স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে স্বামীজীর সঙ্গে তাদের পত্রবিনিময় হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন—

> "স্বামীজী একদিন হাস্যরসময় 'পিকউইক পেপার্স' হইতে অনর্গল কয়েক পৃষ্ঠা মুখস্থ বলিয়া গেলে হরিপদবাবু ভাবিলেন, সন্ন্যাসী হইয়াও ইনি এই সামাজিক গ্রন্থ এত কষ্ট করিয়া বারবার পড়িয়া মুখস্থ করিতে গেলেন কেন? জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "দুইবার পড়িয়াছি—একবার স্কুলে পড়িবার সময়, ও আজ পাঁচ-ছয়মাস হইল আর একবার।" পুনর্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্যের ফলে এইরূপ স্মৃতিশক্তি সম্ভব হয়।"[২২]

এরপর স্বামীজী ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে যান। মহীশূর থেকে কেরলের ত্রিচুর, ক্র্যাঙ্গানোর, এর্নাকুলাম, ত্রিবান্দ্রাম, কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর স্বামীজী ত্রিবান্দ্রামে সুন্দররাম আয়ারের গৃহে আশ্রয় নেন এবং ডিসেম্বর মাসের শেষে কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। স্বামীজীর কন্যাকুমারীতে কি উপলব্ধি ঘটেছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী মুমুক্ষানন্দ প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> "ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে তিনি প্রায় তিন বছর সমগ্র ভারতের অনেকাংশ পদব্রজে পরিভ্রমণ করলেন। এবার যেন তিনি তাঁর পরিব্রাজনের শেষ সীমারেখাটি স্পর্শ করলেন। কন্যাকুমারীর মন্দিরে মাতৃমূর্তির পাদমূলে গভীর আবেগে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। তারপর দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন শিলাখন্ডে এসে সেখানে সারারাত্রি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। পরিব্রাজক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুবিশাল দৃশ্যটি তাঁর মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হলো। ধ্যানমগ্ন স্বামীজী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতকে প্রত্যক্ষ করলেন, আর জানতে পারলেন তার অবনতির কারণ ও পুনরুত্থানের উপায়। অধঃপতিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর জন্য সাহায্য চাইতে আর সেইভাবেই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করতে পাশ্চাত্য গমনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন।"[২৩]

এরপর রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন—

> "এই মহানুভব মানুষটির কাছে ভারতবর্ষ প্রভূতভাবে ঋণী, কারণ আমার শিকাগো যাত্রা তাঁরই পরিকল্পিত। তিনিই আমার মনে এই ভাবটি জাগ্রত

করেন এবং অত্যন্ত জিদের সঙ্গে তা কার্যে রূপায়িত করতে উৎসাহিত করেন।”[২৪]

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর পাশ্চাত্যে যাবার পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন স্বামীজীর অনুগত ও অন্যতম সহযোগী। ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী হায়দ্রাবাদ যান। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্যগ্রহণ করেন। এখানে নবাব বাহাদুর স্যর খুরশিদ জা ও নিজামের প্রধানমন্ত্রী আসমানজীর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি স্বামীজী মহবুব কলেজে ‘আমার পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য’ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি স্বামীজী হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করেন। তাঁকে বিদায় জানাতে সেখানে সহস্রাধিক লোক রেলস্টেশনে এসেছিলেন।

হায়দ্রাবাদ থেকে স্বামীজী মাদ্রাজে ফিরে আসেন। মাদ্রাজী শিষ্যরা তাঁর পাশ্চাত্য গমনের জন্য দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করতে থাকেন। এদিকে পত্রের দ্বারা শ্রীশ্রীমাসারদাদেবীর অনুমতি লাভ করেন স্বামীজী। খেতড়ির দেওয়ান জগমোহনলাল স্বামীজীকে খেতড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। ২২শে এপ্রিল স্বামীজী খেতড়ি মহারাজের পুত্রসন্তান লাভের যে উৎসব তাতে যোগদান করেন। এরপর খেতড়ি ত্যাগের পর গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে পেনিনসুলার জাহাজে করে বোম্বে থেকে শিকাগো ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বম্বে থেকে কলম্বো, কলম্বো

থেকে পেনাং (পিনাং), পেনাং থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে হংকং, ক্যান্টন, জাপান-এ ইয়োকোহামায়, টোকিও দর্শন করে ১৪ই জুলাই 'এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া' জাহাজে করে ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। স্বামীজীর সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন জামসেদজী নসরভনজী টাটা ও লালুভাই। ২৫শে জুলাই সন্ধ্যাবেলায় তিনি ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছান এবং ৩০শে জুলাই রাতে শিকাগোতে উপস্থিত হন। শিকাগোর দৈনন্দিন খরচ বেশি হওয়ায় স্বামীজী বস্টনে মিস স্যানবর্নের ব্রিজি মেডোজ-এ আশ্রয় নেন। স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট আলাসিঙ্গাকে একটি পত্রে লিখেছেন—

> "এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!! এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ— এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।"[২৫]

ইতিমধ্যেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের সঙ্গে ২৫শে আগস্ট অ্যানিস্কোয়াম-এ স্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন রাইট। তিনি স্বামীজীকে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেন। প্রমথনাথ বসু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' (প্রথমভাগ) গ্রন্থে অধ্যাপক জন রাইট সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "স্বামীজীর নিকট অধিক অর্থ নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি চিকাগোর একখানি টিকিট তাঁহাকে কিনিয়া দিলেন এবং প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিগণের থাকিবার ও আহারাদির ব্যবস্থা করার ভার যে কমিটির উপর ছিল, তাহাদের নিকট পত্র

দিলেন। স্বামীজী তাহার উপর ঈশ্বরের অপার করুণা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইলেন।”[২৬]

এরমধ্যেই স্বামীজী ‘ভারতের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী’, ‘হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা’, ‘ভারতীয় বালক-বালিকাদের জীবনরীতি’, ‘ক্রীড়াকৌতুক’, ‘বিদ্যাশিক্ষা’, ‘ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী’, ‘ভারতে মুসলিম শাসন’, ‘ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার’ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। এরপর তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর শিকাগোয় পৌঁছান। জন হেনরি রাইটের দেওয়া ঠিকানা হারিয়ে ফেলায় তিনি অতি কষ্টে একটি খালি বাক্সে রাত্রিযাপন করেন। ক্ষুধার্ত স্বামীজী ভিক্ষা করতে লাগলেন। অবসন্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধিত স্বামীজীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শ্রীযুক্তা জর্জ ডবল্যু হেল। তিনি স্বামীজীকে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে পৌঁছে দেন। স্বামীজী হেল পরিবারের সঙ্গে আজীবন সম্পর্ক রেখেছেন। তিনি মিস্টার হেলকে ‘ফাদার পোপ’ ও মিসেস হেলকে ‘মাদার চার্চ’ বলে ডাকতেন। এছাড়াও হেল পরিবারের চার বোনের কাছে স্বামীজী কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় স্বামীজীর। ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে স্বামীজীকে শ্রীযুক্ত জে. বি। লায়ন ও শ্রীযুক্তা জন বি. লায়ন-এর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকায় এক বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলারই একটা অংশ ছিল ধর্মমহাসভা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা এখানে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করেন। ধর্মমহাসভা শুরু হয় আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হলে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভা শুরু হয়। পৃথিবীর

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদীধর্ম, ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম, কনফুসিয়াসেরধর্ম, শিন্টোধর্ম, পারসিকধর্ম, ক্যাথলিকধর্ম ও প্রটেস্ট্যান্টধর্মের প্রতিনিধিরা এই ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণ করেন। স্বামীজী দ্বিতীয় অধিবেশনে চারজন বক্তার পর প্রথম বক্তৃতা দেন। তিনি প্রথম উচ্চারণ করেন 'হে আমেরিকাবাসী বোন ও ভায়েরা'। এই কথা উচ্চারণের পর প্রায় দুমিনিট ধরে দর্শক ও শ্রোতাদের করতালি চলে। স্বামীজী বলেন—

> "যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের মত সহ্য করি, তাহা নহে—সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশান' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য) শব্দটি কোনমতে অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদিগকে বলিতে গর্ববোধ করিতেছি যে, যে বৎসর রোমানদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে আমরাই তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আজও তাহাদিগকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। জরথুষ্ট্রের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।"[২৭]

১৫ই সেপ্টেম্বর 'কুয়োর ব্যাঙ'-এর গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংকীর্ণতার দিকটি স্বামীজী তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—

> "হে ভ্রাতৃগণ এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি ও ইহাকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ বোধ করিতেছেন! মুসলমানও আপনার ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির অবরোধ ভাঙিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই। আশাকরি ঈশ্বর ভবিষ্যতে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।"[২৮]

১৯শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২০ সেপ্টেম্বর 'ভারতের একান্ত অভাব ধর্মের নয়' বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, ২৬শে সেপ্টেম্বর 'বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ে' এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর বিদায় ভাষণ দেন। শেষ বিদায় ভাষণে স্বামীজী বলেন—

> "বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া যায়?—না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে নিজের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা, বায়ু ও জল ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই সকল উপাদানকে বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে বাড়িয়া উঠে। ধর্মসম্বন্ধেও ঐরূপ। খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের

সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।"[২৯]

শিকাগো ধর্মমহাসভার পর থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত স্বামীজী নিউইয়র্ক, লণ্ডনসহ অন্যত্র বক্তৃতা দান করেন ও বেদান্ত প্রচার করেন। ই. টি. স্টার্ডি, সেভিয়ার দম্পতি, মিস ওলিবুল, নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি 'ভারতীয় নারীসমাজ', 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস', 'হিন্দুধর্ম', 'ভারতের ধর্মসমূহ', 'পুনর্জন্ম', 'ভারতীয় রীতিনীতি', 'মানুষের দেবত্ব', 'ধর্মসমন্বয়', 'প্রগতিশীল ধর্ম', 'বুদ্ধ', 'বিশ্বে ভারতের দান' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থান করেন ও ডিসেম্বরে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ সম্পর্কে তিনি ক্লাস নেন। প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণা তাঁর স্বামীজীর 'কৃস্টিন' গ্রন্থে সহস্রদ্বীপোদ্যানের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কের কথা স্মরণ করতে করতে স্বামীজী বলছেন— তাঁর জীবনের সেরা সময় তিনি সেখানে অতিবাহিত করেছেন। প্রচন্ড উৎসাহের সঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কৃস্টিনের ভাষ্যানুযায়ী, স্বামীজী দুটি উদ্দেশ্যে তখন কাজ করছেন। প্রথমতঃ- তাঁর শিষ্যদের মধ্যে 'মোক্ষ' অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তির ইচ্ছা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ- আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য এই দলকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।"[৩০]

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ করেন এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি কলম্বো পৌঁছান। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। মার্গারেট নোবেল স্বামীজীর

ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই আলমোড়া থেকে স্বামীজী মার্গারেট নোবেলকে পত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়ে লেখেন—

> "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।"[৩১]

স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মার্চ তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। মার্গারেট নোবেল নিবেদিতা পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর স্বামীজী উত্তরভারত পরিভ্রমণ করেন এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থান, অমরনাথ, ক্ষীরভবানী প্রভৃতি দর্শন করে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ জানিয়েছেন—

> "ভারতীয় জাতির প্রাণে নবপ্রেরণার আগুন জ্বালাইয়া এবং সর্বজাগতিক উদার আধ্যাত্মিক ভাবধারা জীবনে ধরিয়া রাখিবার জন্য ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঈশ্বরজ্ঞানে মানব সেবার আদর্শ স্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন।"[৩২]

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাসহ বিবেকানন্দ 'গোলকোণ্ডা' জাহাজে করে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যাত্রাপথের বর্ণনা 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতনন্দকে লিখে

পাঠান; যা 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থটির নাম হয় 'পরিব্রাজক'। তিনি প্যারিস, ভিয়েনা, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। এরপর স্বামীজী পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তিনি বেলুড় মঠেই অবস্থান করেন। ছাগল (মটরু), কুকুর (বাঘা), কিছু রাজহাঁস ও একটি কোকিলের তিনি দেখাশোনা করতেন। বাগানের সাঁওতাল কুলিদের তিনি নিজে হাতে নরনারায়ণ জ্ঞানে খাইয়েছেন। নিবেদিতাকে মৃত্যুর দু'দিন আগে আমন্ত্রণ জানিয়ে খাওয়ান ও নিজে হাত মুছিয়ে দেন। অবশেষে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই রাত্রি ৯টায় স্বামীজী পরলোক গমন করেন। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর মহাসমাধির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিলাম—একখানি সুন্দর গালিচার উপর শয়ান তাঁহার দিব্যভাবদীপ্ত দেহ বিভূতি—বিভূষিত, মস্তক পুষ্প-কিরীট ভূষণে এবং সর্বাঙ্গ নবরঞ্জিত গৈরিকবসনে সুসজ্জিত; প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে রুদ্রাক্ষের জপমালাটি জড়িত এবং ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ন্যায় অক্ষিতারা অন্তর্মুখী ও অর্ধনিমীলত—দুই পার্শ্বে ধূপদানি হইতে ধূপের মধুর সৌরভে তাঁহার ঘরটি আমোদিত।"[৩৩]

পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও মন্ত্রদ্রষ্টা স্বামীজী আজও আমাদের জীবনে বিশাল বটবৃক্ষস্বরূপ। তাঁর জীবন ও বাণী এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

উল্লেখপঞ্জী

১। বিবেকানন্দ চরিত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৮।

২। স্বামী বিবেকানন্দ পাঁচালী, শ্রীমনীন্দ্রকুমার সরকার, প্রথম প্রকাশ : শ্রীশ্রী মায়ের তিথি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫, প্রকাশক : শ্রীদীপক সরকার, ২, দেশবন্ধু নগর, সোদপুর, ২৪ পরগণা (উঃ), পৃ. ৪-৫।

৩। স্বামীজীর মাতৃভক্তি, স্বামী তথাগতানন্দ, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩, প্রথম প্রকাশ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২, প্রথম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৯, পৃ. ১০।

৪। বিবেকানন্দ চিত্রকথা, স্বামী শান্তরূপানন্দ, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩, পৃ. ৯।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ৯।

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী সারদানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ৪০তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২, পৃ. ৪১।

৭। বিবেকানন্দ চরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৬।

৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী সারদানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, ৪০তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২, পৃ. ১০৯-১১০।

৯। স্বামী বিবেকানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ১৪।

১০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২৯তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৬, পৃ. ১০৬৪।

১১। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৫৩তম পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৩৬।

১২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২৯তম পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৬, পৃ. ১০৮৮।

১৩। পরিব্রাজক স্বামীজী : দেশে ও বিদেশে (বরানগর মঠ থেকে শিকাগো), ভারতপরিক্রমা ও শিকাগো বক্তৃতা, প্রকাশক- স্বামী সর্বভূতানন্দ, সম্পাদক- রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মার্চ ২০১২, পৃ. ১২।
১৪। তদেব, পৃ. ১৬-১৭।
১৫। বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, রোমাঁ রোলাঁ, বঙ্গানুবাদ : ঋষি দাস, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ ও ৪৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা ৭০০০০৭, নবম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৪২৪, পৃ. ১৬।
১৬। সত্যের সন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ জীবন ও দর্শন, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মডেল পাবলিশিং হাউস, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১০১।
১৭। জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বামী বিবেকানন্দ, সম্পাদনা স্বামী চৈতন্যানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার কলকাতা, প্রকাশকাল ১৪ মে ২০১৪, পৃ. ৬।
১৮। পরিব্রাজক স্বামীজী : দেশে ও বিদেশে (বরানগর মঠ থেকে শিকাগো), ভারতপরিক্রমা ও শিকাগো বক্তৃতা, প্রকাশক- স্বামী সর্বভূতানন্দ, সম্পাদক- রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মার্চ ২০১২, পৃ. ২৯-৩০।
১৯। জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্বামী বিবেকানন্দ, সম্পাদনা : স্বামী চৈতন্যানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৯২২।
২০। পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২২তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২, পৃ. ১০৪-১০৫।
২১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২০, পৃ. ২৭৪-৭৫।
২২। তদেব, পৃ. ২৯৭।
২৩। স্বামী বিবেকানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ২৭।
২৪। তদেব, পৃ. ৩৮।
২৫। পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২২তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২, পৃ. ৭৪।
২৬। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, প্রমথনাথ বসু, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৩১৩।

২৭। শিকাগো বক্তৃতামালা, পৃ. স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণমঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, প্রকাশক : স্বামী আত্মস্থানন্দ, সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণমঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া—৭১১২০২, পশ্চিমবঙ্গ, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১৪-১৫।

২৮। তদেব, পৃ. ১৮।

২৯। তদেব, পৃ. ৪৮।

৩০। স্বামীজীর কৃস্টিন, প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণা, প্রকাশক : স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৯।

৩১। পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ২২তম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬।

৩২। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, প্রকাশক : স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, ৫৩তম পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৮৯।

৩৩। বহুরূপে বিবেকানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ, প্রকাশক : স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, পৃ. ২৩১।